বাংলা নববর্ষ বাঙালীর আবেগ ও মননের সাথে ওতপ্রোতভবে জড়িত। করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এবারে নববর্ষের উদযাপনে ভাঁটা পড়েছে। এছাড়া পশ্চিম-বাংলায় নির্বাচনের কারণে ছিল অন্যরকম উদ্যম, যার আড়ালে নববর্ষ কিছুটা মলীন হয়েছে। এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপে অনেকেই হারিয়েছেন তাঁদের প্রিয়জন-দের। আমরা সেই সমস্ত প্রয়াত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করি। এই নববর্ষে সবাই শুধু একটা নতুন উদ্বেগহীন জীবনের জন্যই অধীরভাবে অপেক্ষারত...

গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ১১

এপ্রিল ২০২১

নববর্ষ সংখ্যা

কলম হাতে

আবদুল বাতেন, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সমীর দাস, সামিমা খাতুন, অমিত কুমার সাহা, প্রণব কুমার বসু, রিয়া মিত্র, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

কালচক্রে একটি বিশেষ সময়ে ফিরে আসাই হল নববর্ষ। প্রকৃতি নানান সাজে, নানান ভালো কিংবা মন্দ সংকেত নিয়ে ফিরে আসে নতুন বর্ষে নতুন ভাবে। বলা হয়, চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়িয়ে আপন রূপবৈচিত্র্য নিয়ে ১লা বৈশাখী প্রভাতের আগমন হয়। অর্থাৎ নববর্ষ মানে বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম, আশা-নিরাশার ধারাবাহিকতা নিয়ে বর্ষবরণ। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন,

"ভূত-রূপ সিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর।"

বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে মধু-কবির কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলেই মনে হয়। সারাবিশ্ব যে ভয়ানক ভাইরাসের আক্রমণে মৃত্যু দুয়ারে এসে উপস্থিত, তার থেকে বাঁচার সঠিক উপায় জানা না থাকলেও সাবধানতা অবলম্বন করা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পুরানো বছরের সংকট থেকে নিজেদের তথা বিশ্বকে রক্ষা করার নতুন সংকল্প ও উদ্যোগ নিলে, তবে আমাদের বর্ষবরণ সার্থক হবে।

তাই কবিগুরুর ভাষায় কামনা করি,

"করো সুখী, থাকো সুখে
প্রীতিভরে হাসি মুখে..."

(নববর্ষ, চিত্রা কাব্য গ্রন্থ)

শুভ বাংলা নববর্ষ

(সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন) ■

বিনীতা —রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ কোনো এক গাঁয়ের বধূ...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

পাঠকের দরবার

শ্রীমতি সাগরিকা চক্রবর্তী,সাহিত্যিকা

জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

জানুয়ারি সংখ্যায় শ্রী পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের লেখাটা পড়লাম। এটা ওনার একদম অন্য ধরনের একটি লেখা। আগে ওনার যে লেখাগুলো পড়েছি সেগুলো থেকে একদমই ভিন্ন, খুব ভালো লাগলো, প্রকৃতির এই রূপ আমরা সকলেই দেখি, কিন্তু ওনার বর্ণনায় যেন নতুন করে দেখলাম সুন্দর এই রূপ, সব সময়ের মতো এই লেখাটিও ভীষণ ভালো।

দীপঙ্কর বাবুর 'গা গেরামের' গল্পটা পড়লাম খুব ভালো লাগলো। আমাদের এক প্রাণের উৎসব নবান্ন সম্পর্কে জানলাম।

শ্রীমতি জয়তী গাঙ্গুলীর 'বিশ্বাস' খুব বাস্তব সম্মত, বেশ ভালো লাগলো ওনার লেখা।

শ্রী প্রণব কুমার বসু মহাশয়ের 'গরমিল' বেশ মজার – খুব সুন্দর করে লিখেছেন স্ত্রী আর ইস্তিরি দুটোই গরম থাকলে কেমন ছেঁকা লাগে।

শ্রী বিশ্ব প্রসূন চ্যাটার্জীবাবুর লেখা খুব ভালো, খুব বাস্তব কাছের মানুষের মন কখনোই চায় না আপনজন দূরে যাক।

আমি খেলার খুব একটা তেমন বুঝি না, তবে দেখি, ভালো লাগে। সুজনবাবুর 'খেলার দিগন্ত' পড়ে বেশ ভালো লাগলো।

পাঠকের দরবার

সন্দীপ বাবুর "লেট'স হোপ" পড়লাম খুব ভালো লাগলো। ঠিকই তো, ওনার মতো আমারাও আশায় আছি – সব যেন আগের মতো হয়ে যায়।

ডঃ মালা মুখার্জী মহাশয়ার 'তারা খসার রাত' খুব সুন্দর একটি গল্প। তিন্নির প্রতীক্ষা তার আব্বুর জন্য, আর রৌণক সরকারের প্রতীক্ষা তার তিন্নিকে দেখার... কিছুটা হলেও পূর্ণ করেছে ঈশ্বর।

সংহিতা ভট্টাচার্য্যর লেখাটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী, সত্যিই তো সম্পর্কের বন্ধন তো এমনি হয়।

গুঞ্জনের পাতায় প্রকাশিত চিত্রগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রেরণা দান করে। 'গুঞ্জন'এর পরবর্তী সংখ্যাগুলি খুব শীঘ্র পড়ার আশায় রইলাম। ■

দপ্তর থেকে

'পাণ্ডুলিপি'-র তরফ থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি 'গুঞ্জন'-কে নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য । কিন্তু পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল হওয়ায়, আমরা এখন আর সময়মত প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারছি না। একই কারণে আমাদের 'গুঞ্জন'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও কম করতে হচ্ছে। তাই এখন থেকে লেখা চয়নের ব্যাপারেও আমাদের একটু বেশি কড়াকড়ি করতে হচ্ছে । ■

বিনীত

কর্তৃপক্ষ, পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"অন্ত নিয়ে এতটা ভেবো না।
মৃত্যুপথে যেতে দাও
মানুষের মতো মর্যাদায় – শুধু
তোমরা সকলে ভালো থেকো।
কিন্তু কাকে বলে ভালো থাকা? জানো?"

(যাবার সময় বলেছিলেনঃ কবি শঙ্খ ঘোষ)

৺শ্রী শঙ্খ ঘোষ

জন্মঃ- ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

পরলোকগমনঃ- ২১ এপ্রিল ২০২১

বাংলা কবিতার ভাণ্ডার থেকে কিংবদন্তিপ্রতিম পরম শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ মহাশয় এক অনন্ত নিদ্রায় চিরদিনের মতো শায়িত হলেন। যে পঞ্চপাণ্ডবের ক্ষুরধার লেখায় সাহিত্য তথা কবিতা জগত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলজ্বল করত, সেই পঞ্চ-জ্যোতিষ্কের শেষ জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ শঙ্খবাবুও এবার অমৃতলোকে হারিয়ে গেলেন।

শুধু অগণিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে রেখে গেলেন তাঁর মূল্যবান কবিতার ভাণ্ডার। 'দিনগুলি রাতগুলি', 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ', 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি চির অমর হয়ে থাকবেন এই ধরাধামে।

হয়তো জীবনের সত্যটা খুব সহজে অনুধাবন করতে পারেন কবি মানস-পট। তাই শুধু সকলের কাছে রেখে যান — 'তোমরা সকলে ভালো থেকো' — এই ভালবাসার বাণীটুকু... ■

Photo by binh dang nam on Unsplash

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (২)

মহারাজ চা খেয়ে যেতে বললেন। সাড়ে ছয়টার মধ্যে বেড়িয়ে পড়েছি। সেই নর্মদার পাড় ধরেই চলা, বালি আর চড়াই-উৎরাই। খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে জল রাখলে সেটাও ভারী বলে মনে হচ্ছে, চলতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের তলায় বালি, মাথার উপর সূর্যের তাপ, ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়। কিছু ছেলে নদীতে মাছ ধরছে। তাদের তাঁবুতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। কালকের ঐ ছেলেটি নকুল দাস দেখলাম আমাদেরই পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে গেল।

আমাদের দৃষ্টি মায়ের উপর না থাকলে কি হবে, মা তাঁর এই অধম সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রেখেছেন সেটা বুঝতে পারছি। কোন অশুভ শক্তি পরিক্রমাকারীকে কিছু করতে পারে না। নর্মদা নামের কবচ মালাই তাদের রক্ষা করে। এই কথাটা বহু শুনেছি কিন্তু কথাটা যে সত্যি আমি তার সাক্ষী। নদীর চড় ধরে হাঁটা। মাছ শিকারীরা আনন্দ করে মাছ ধরছে। এখানে নাকি বড় বড় মাছ আছে।

আজ ২৪শে অক্টোবর। খাগরোলা ঘাট থেকে চলতে

চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বালিতে পা আটকে যাচ্ছে। জেলেদের একটা তাঁবুতে আবার বসে পড়লাম, চলার ক্ষমতা নেই। ওরাই আমাদের অবস্থা দেখে ঠান্ডা জল খাওয়ালো। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। আর কতক্ষণ সময় নষ্ট করবো তাই আবার চলা শুরু। 'নর্মদে হর' বলে এগিয়ে চলেছি। দুপুর ১টা। একটি মন্দিরের চূড়া দেখে আশ্বস্ত হলাম। প্রায় দেড়টা নাগাদ ফেরারী ঘাটে এসে পৌছালাম। নদীর চড় থেকে অনেকটা উঁচুতে একটা পাহাড়ের টিলার উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা সুন্দর আশ্রম। আমরা যেতেই হাসি মুখে চৈতন্য মহারাজ আমাদের গ্রহণ করলেন। ওই ছেলেটি আমাদের আগেই এসে এখানে বসে আছে। একজনের মতো ভোজন প্রসাদ আছে। ছেলেটিকে নিয়ে মোট পাঁচজন। তাই মহারাজ বার বার এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। মহারাজ পুরো নর্মদা পরিক্রমা করেননি। পরিক্রমা শেষ না করেই এখানে আসন পেতেছেন। উনি হরিদ্বারের লোক। আমাদের আজ এখানে থেকে যাওয়ার জন্য উনি খুব অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু আমাদের এবারের পরিক্রমার সময় খুব অল্প। তাই পথে এবার নামো সাথী...

দুপুর তিনটে। কিন্তু গায়ে আগুনের মতো লাগছে সূর্যের তাপ। যেহেতু আমরা নদীর পাড় ধরে চলেছি তাই পথ খুবই দুর্গম। কিছু শাখা নদী নর্মদার মূল স্রোতে

এসে মিশেছে। এরা নর্মদার কলেবরকে বৃদ্ধি করেছে। পেলাম এরোণ্ডীকে আর ঝোড়ো।

নদীর পাড়ে অড়হর চাষ হচ্ছে। মানুষ দেখা যায় না এতই ঘন গাছ। 'নর্মদে হর' ধ্বনি দিয়ে একে অন্যের উপস্থিতি অনুমান করার চেষ্টা করছি মাত্র। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে যাওয়ার পর কিছুটা ফাঁকা জায়গা পেলাম, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য। মাঠের মধ্যে আবার চাষের জমিতে উঠে এসেছি। প্রায় সাড়ে পাঁচটা। কোথায় আজ আমাদের রাত্রিবাস হবে, মা কোথায় আমাদের জায়গা ঠিক করেছেন জানি না। দিব্যানন্দজীকে অনুসরণ করে আমরা তিনজন পরিক্রমাকারী এগিয়ে চলেছি। যত বেলা পড়ে আসছে আবহাওয়ার ঠিক ততটাই পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা কোলকাতা থেকে এসেছি, তাই এই আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্ত নই। এই সব ভাবতে ভাবতে যখন একটি আশ্রমের সন্ধান পেলাম তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। এখানে সূর্য ডুবলে খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে।

আমরা একটি নর্মদার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। দুজন মহারাজ ছিলেন। আমাদের দেখেই বিরক্ত হলেন। প্রথমে তো থাকতেই দেবেন না, মন্দিরের বারান্দায় শোবার কথা বলাতে তাতেও আপত্তি। কিন্তু আমাদের আর চলার ক্ষমতা নেই তাছাড়া অন্ধকার হয়ে গেছে। অনন্যোপায় হয়ে মন্দিরের বারান্দাতেই থাকতে দিলেন। কিন্তু সামান্য জল বা চা খাওয়ার কথাও বললেন না।

এরপর আমরা গাছের ডাল ভেঙে ঝাড়ু বানালাম, আর তা দিয়ে বারান্দাটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করে, চারজনের রাত্রিবাসের জন্য কিছুটা উপযুক্ত জায়গা করে নিলাম।

মায়ের সন্ধ্যারতি করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আর আসে? আমাদের সাথে আরও কিছু মশা পরিক্রমা করছে বুঝতে পারলাম। তারা সারা রাত ভজনগীতিতে মন্দির প্রাঙ্গন মাতিয়ে রাখল। তারই মধ্যে এই আশ্রমের দুজন মহারাজ আমাদের পরিক্রমার বৈধতা নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। পেটে খিদে থাকলে পূর্ণিমার চাঁদকেও ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়। আমরা জুতো পায়ে পরিক্রমা করছি কেন? বাঙালী মাছ খায় ইত্যাদি...

"যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক
তারা তো পারে না জানতে
তাদের চেয়েও তুমি কাছে আছো
আমার হৃদয় খনিতে।"

এই সব অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের প্রকাশ। শুনলাম এই স্থানটি অগস্ত্য মুনির তপস্থলী। অত্যন্ত শুদ্ধ মনে কিছুক্ষণ তাঁকে স্মরণ করে নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৯)

বাড়িটা অনেক পুরানো। প্রথম দর্শনেই অনুমান করা যায় যে অনেক বছর ধরে এই বাড়িটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। একতলা ছাদ আঁটা বাড়ি। পিকু ওই বাড়ির সামনে কাকে ফোন করতেই কিছুক্ষণ বাদে একটা বেঁটে-খাটো লোক এসে পিকুর হাতে চাবি দিয়ে বিদায় নিল। বিস্ময়ের সাথে রীনা জানতে চাইল এটা কার বাড়ি! পিকু বাড়ির দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে চারিদিকে আলো অন করে বলল, "এটা আমার বাড়ি। ছোটবেলায় আমরা এখানেই থাকতাম। তারপরে কলকাতায় চলে যাই। এটা অনেক বছর বন্ধ ছিল। ওই পাশের বাড়ির এক সিকিউরিটি কাকু একটু-আধটু দেখাশোনা করেন, ওনার কাছেই চাবি থাকে। আমার আর আসা হয় না। কেয়া ম্যাডাম বলতে, আমার মাথায় এল এখানে আসার কথা। একদিকে ভালোই হল, এই অজুহাতে ক'দিন এই বাড়িতে থাকাও হয়ে যাবে। একটু অগোছালো আছে। আমি সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছি।

পিছন থেকে কেয়া বলে উঠল, "আরে আপনাকে অতো

ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা ঠিকঠাক করে নেব। আপনি বরং ডিনারের ব্যবস্থা করুন, বড্ড খিদে পেয়েছে আমাদের।" পিকু বাইরে থেকে খাবার কিনে এনে বাড়িতে ঢুকে চারদিকটায় চোখ ঘুরিয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। এ কি দেখেছে ও... একেবারে ঠিক ছোটবেলার সেই সাজানো গুছানো ঘরের মতো।

— কি চমকে দিলাম মনে হচ্ছে! এইটুকু সময়ে যেইটুকু পেরেছি আর কি।

— চমকে দিলেন মানে একবারে পিলে চমকে দিলেন কেয়া জি। এ তো একেবারে আমার ছোটবেলার ঘর। জানেন এই ঘরটায় আমার দাদু আর আমি থাকতাম। কত দুষ্টু-মিষ্টি স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

— একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো যদি কিছু মনে না করেন। কিছুটা ইতস্তত হয়ে কেয়া প্রশ্ন করল।

— না না। বলুন কি জানতে চান?

— আপনারা এখান ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলেন কেন? জায়গাটা তো বেশ সুন্দর। একটু চুপ থেকে পিকু বলল, "আমার বাবা ও দাদু এখানের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। আমাদের আর্থিক স্বাছন্দ্য মোটেই খারাপ ছিল না। দাদু, বাবা-মা, বোন আর আমি এই নিয়ে আমাদের পরিবার ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে মন্দিরে কার প্রাধান্য বেশি থাকবে এই নিয়ে একটা বিবাদ চলছিল। নিয়ম অনুযায়ী আমার

বাবার প্রধান পুরোহিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাকি পুরোহিতরা সেটা মানতে রাজি ছিল না। নানাভাবে আমার বাবাকে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজছিল। আর আমার কৃপায় সেই সুযোগটাও পেয়ে গেলো।

— আপানার কৃপায় মানে?

— আমার একটা বন্ধু ছিল। বলতে পারেন একবারে প্রিয় বন্ধু। আমরা একসাথে স্কুলে পড়তাম। তবে ও মুসলিম ছিল। একদিন আমার সাথে আমার বাড়িতে আসে। আমার মা আর পাঁচজনের মতো ওকেও যত্ন করেন। কিন্তু ও বাড়ি চলে যাওয়ার পর এক ঝড় বয়ে গেলো আমাদের জীবনে। ওর আসার খবরটা মন্দিরের অন্য পুরোহিতদের কানে গিয়ে পৌঁছালো। আর তাঁরা ফন্দি এঁটে ষড়যন্ত্র করে অভিযোগ করল, যে বাড়িতে মুসলিমদের আনাগোনা, খাওয়া-দাওয়া সেই বাড়ির পুরোহিতকে মন্দিরের পৌরোহিত্যের অধিকার দেওয়া যেতে পারেনা। আর আমাদের জমিটার উপর ছলেবলে মামলা চাপিয়ে দিল। আর এইভাবে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হল।

— আর আপনার সেই প্রিয় বন্ধুটির সাথে যোগাযোগ আছে?

— না, কোন যোগাযোগ নেই। ওকে তো বলে যাওয়ার সুযোগই পাইনি। শুধু মানুষের লোভ ক্ষমতার জয় হয়। তাই তো আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ বন্ধুটিকে সেদিন শিখণ্ডী বানিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে ছিল। যদিও পরে

এই বাড়িটাকে মামলায় জিতে ফেরত পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার বন্ধুটাকে আর খুঁজে পেলাম না — এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিকু।

কেয়া পিকুর হাতটা ধরে বলল, "আশা হারাবেন না, দেখবেন হয়তো কোনদিন দেখা হয়ে যাবে, কোন জায়গায় কোন সময়ে। আচ্ছা যদি আপনার সেই বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যায় চিনতে পারবেন!"

পিকু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, এইসব সিনেমায় শুনতে দেখতে ভালো লাগে। ওসব বাস্তবে হয় না ম্যাডাম। সে হয়ত এই বন্ধুকে ভুলেই গিয়েছে। এতো ছোটবেলা নিয়ে কেউ ভাবে না। আরে এই খাবারগুলো খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আর রীনা ম্যাডাম কোথায়?

— রীনা রেস্ট নিচ্ছে। আচ্ছা ধরুন... হঠাৎ কেয়ার ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রীনে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠল রাহুল কলিং... কেয়া ফোনটা নিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে চলে গেলো।

পরের কয়েকদিন সকালে তারা মথুরা আর বৃন্দাবনের নানান মন্দির ঘুরে দেখল। যমুনার ঘাটে যমুনা বিহার করল। এরপর কংসের কারাগার, বরশানা, গোকুল, নিকুঞ্জবন, বাঁকে বিহারী মন্দির, কাত্যায়নী মন্দির প্রভৃতি জায়গা ঘুরে দেখল। দু'দিন একটু বেশি থাকতে হল। কাল আবার দিল্লি ফিরে যাবে।

তখন মাঝরাত সবাই সবার ঘরে ঘুমাচ্ছে। পিকুর ঘরে

হঠাৎ একটা আওয়াজ হচ্ছিল। টেবিলের সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে কি একটা খুঁজচ্ছে! পিকু কে কে করতে... সে ছুটে বাইরে বেরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দরজার সামনে পড়ে যায়। পিকু লাইট অন করে দেখে কেয়া মেঝেতে পড়ে আছে, আর সামনে লোহার চেয়ারে তার পা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। পিকু সামনে এসে কেয়াকে বলে, "একি আপনি আমার ঘরে অন্ধকারে কি করছিলেন?" কেয়া থতমত হয়ে বলে, "আমাকে এখন যেতে দিন, আপনাকে আমি সব বলব পরে। এখন না গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

— আপনার হাতে ওটা কি দেখি? আর কি সর্বনাশ হবে শুনি? আগে আপনার পা-টা ব্যান্ডেজ করি তারপর সব কথা। ইস কতটা কেটে গেছে?

— পিকু, পাগালামি করবেন না। আমাকে যেতে দিন।

— না, কোন ভাবেই নয়।

— আগে আমাকে ধরে এখানে বসুন। আর দেখি ওই ব্যাগটায় কি আছে?

— না এই ব্যাগটা দিতে পারবনা।

এই নিয়ে প্রায় কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হতে থাকে দুজনের মধ্যে। কেয়া ব্যাগটা দিতে চায় না, আর পিকু ব্যাগটায় কি আছে তা দেখবে বলে নাছোড়বান্দা করতে থাকে। পিকু প্রায় ব্যাগটা নিজের নাগালে নিয়েছি, অমনি রীনা পিকুর হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে নেয়। পিকু রীনার দিকে

তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। রীনার এক হাতে ব্যাগ আরেক হাতে...বন্দুক। আর পিকু তার গান পয়েন্টে। রীনা কেয়াকে উদ্দেশ্য করে চোখের ইশারা করে কি যেন বলে। আর কেয়া বাধ্য মেয়ের মতো পিকুর হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। পিকু পুরো ব্যাপারটা দেখে ভীত ও অবাক হয়ে যায়। তার গলা শুকিয়ে আসে। তবু শুকনো গলায় বলে, “আপনারা কে? কি চান? আমাকে বাঁধলেন কেন? কেয়া ম্যাডাম আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।” কেয়ার মুখ দিয়ে একটা কথাও আর বেরল না। তবে, অস্পষ্ট এক না বলা কথার ঝুলি যেন তার দু’চোখ দিয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে নেমে আসল। পাশ থেকে রীনা বলে উঠল, “ও কি বলবে... আপনি জানতে চাইছিলেন এই ব্যাগে কি আছে? এতে মারণ অস্ত্র বোমা আছে। কি ভাবছেন! হ্যাঁ আমরা উগ্রবাদীদল। বিশেষ কিছু জায়গা আমরা পয়েন্ট আউট করেছি, যেগুলো আজকের পর আর থাকবেনা। আমাদের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির দরকার ছিল যার সহায়তায় জায়গাগুলো ঘুরে পয়েন্ট অ্যান্ড ডেসট্রয় মিশন প্ল্যানিং করতে পারি। আর আপনার এজেন্সি ছিল এইসব ইন্ডিয়ান ট্র্যাভেল এজেন্সিদের মধ্যে বেস্ট। আপনার স্ত্রীর তরফ থেকে যারা এখানে আসার কথা ছিল, তাদের প্ল্যান মাফিক আটক করে আমরা ওদের বেশ ধরে চলে আসি। সবই প্ল্যান মাফিক চলছিল, কিন্তু আপনি ঘুমের ওষুধ খেয়েও কি

করে জেগে গেলেন! এটাই বিস্ময়ের। তবে যাই হোক এতো কিছু জানার পর তো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই গুড বাই পিকু জি।”

কেয়া তখনি বলে “রীনা উনি এখানে বাঁধা থাকুন। তুমি যাও। এখন এনাকে মারলে প্ল্যান মাফিক কাজ করতে দেরি হয়ে যাবে। আর তাছাড়া রাহুল ওখানে পৌঁছে গিয়েছে, আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আমি এখানে আছি। তোমাদের কাজ শেষ হলেই আমাকে জানাবে, তখনি এনাকে শুট করবো।”

“ঠিক আছে সেটাই তাহলে হোক,” এই বলে রীনা ব্যাগটা নিয়ে বেড়িয়ে গেলো। কেয়া বাইরের দরজাটা লক করে এসে পিকুর সামনের চেয়ারে এসে ধপ করে বসে পড়ল। পিকু কেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, “আপনারা এতো নীচ মনের মানুষ, এতোগুলো মানুষের প্রাণ নিতে আপনাদের হাত কাঁপে না! ছিঃ... ছিঃ... এসব দেখার আগে আমাকে মেরে দিতেই পারতেন।”

কেয়া মাথাটা তুলে নম্রস্বরে বলে “আপনাকে কি করে মরে যেতে দিতে পারি? নাহ্ আর যাই হোক এটা কোনদিনই পারব না। আপনি যে...”

“এতো এতো মানুষ মারতে আপনাদের হাত কাঁপে না, আমি তো কোন নস্যি। তা আমাকে বাঁচাবেন কেন! বিস্ময়ের সাথে জানতে চায় পিকু।”

— আমি কি করে আপনাকে মারব বা মরতে দেব! আপনি যে আমার ছোটবেলার বন্ধু পিকু...

— ছোটবেলার বন্ধু মানে?

— হ্যাঁ আমি সেই খুশবু। এই বলে নিজের পার্স থেকে পিকু আর খুশবুর স্কুল সেরিমনিতে গানের অনুষ্ঠানে এক সাথে তোলা ছবিটা সে পিকুকে দেখাল। দুই পুরানো বন্ধুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। পিকুর মনে আনন্দের সাথে জেগে উঠল অনেক প্রশ্নের দোলাচল। একে একে পিকু কৌতূহলী শিশুর মতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। যেমন – পিকু যাওয়ার পর খুশবু কি তাকে খুঁজেছে? তার নাম কেয়া হল কি করে? সে এই রকম চক্রের সাথে কি ভাবে জড়িয়ে পড়ল ইত্যাদি। খুশবু, ওরফে কেয়া পিকুর কোলে মাথা রেখে একটা শান্তির নীর খুঁজে পাওয়ার মতো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বলল সব... সময় যে বড়ো কম..." পিকুও ঝুঁকে কেয়ার মাথার উপর মাথাটা রাখল। ■

স্বাগতম ১৪২৮

স্বাগতম ১৪২৮

ফিরে আসুক করোনা মুক্ত জীবন

শুভ নববর্ষ

সুখ আসুক

স্বস্তি আসুক

সুখ আসুক

শুভ নববর্ষ

শান্তি আসুক

ফিরে আসুক করোনা মুক্ত

শান্তি আসুক

সুখ আসুক

বর্ষবরণ

সমীর দাস

কালচক্র চক্রাবর্তে, ঘুরে ঘুরে যায়
বছরেরা শেষ হয়ে, পিছে চলে যায়।
চলে গিয়ে জমা হয়, হিসাব খাতায়
নতুনেরা এসে যায়, তার জায়গায়।

চলে যায় ঢলে হায়, পুরনো বরষ
দরজায় এসে যায়, নতুন পরশ।
অবশেষে বর্ষশেষে, এল নববর্ষ
অবভাসে অভিলাষে, মনে জাগে হর্ষ।

এ বৈশাখে নব শাখে, নতুন পাতায়
ঋতুচক্রে আবর্তনে, ঋতু বদলায়।
মহানন্দে মন মজে, আশায় আশায়
হরষিত উল্লসিত, নব ভরসায়।

বিদায় সংবর্ধনা, লও হে প্রবীন
অভ্যর্থনা নব সালে, স্বাগত নবীন। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

আজব রঙ্গ

রিয়া মিত্র

বাসের সিটে পা দুলিয়ে মনের সুখে হাওয়া খেতে খেতে ঢুলুঢুলু চোখে চলেছি অফিসে। রোজই যাতায়াত মিলিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের বাস-জার্নি করতে হয়। এই রুটের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর এবং বেশ কয়েকজন যাত্রীও খুব মুখ পরিচিত হয়ে গেছে। এই সময়ের বেশিরভাগ যাত্রীই প্রায় আমার মতোই বয়সের মাঝ বরাবর পৌঁছে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রোজ ধুঁকতে ধুঁকতে অফিস করে।

আজও রোজকার মতো বাসে উঠে নিজের পছন্দের একদম শেষে ডান দিকের জানলার পার্মানেন্ট সিটটা দখল করে বসলুম। বাসে উঠে পান চিবুতে চিবুতে সকলের দিকে একনজর চোখ বুলিয়ে নিজের সিটে গিয়ে ধপ করে হেলান দিয়ে বসলুম। এ বাসের যাত্রীদের কোনো ব্যাপারেই কারোর হেলদোল নেই, ঝাঁকুনিতে অর্ধনিমীলিত চোখটা একবার খুলে আবার অনন্ত শয়নে নিমজ্জিত হন, যেন এটাই তাঁদের জন্মগ্রহণের একম অদ্বিতীয়ম উদ্দেশ্য। তো এহেন বাসে হঠাৎ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে উঠলেন সকলে। কারণটা আর কিছুই নয়, বাসের মুনি

বিভ্রাট

ঋষিদের নিদ্রারূপ কঠোর ধ্যানভঙ্গ করতে আজ হঠাৎই বাসে এক রম্ভার আগমন ঘটেছে। আমিও নিজের নেত্র উন্মোচিত করে রম্ভাকে দর্শন করে নিজের পুরুষজনম সার্থক করছি, চোখ দুটোয় আজ আর নিদ্রাদেবী অবস্থান করছেন না।

বাসে অফিস টাইমের ভীড় বাড়তে শুরু করেছে। সামনে লোক দাঁড়িয়ে পড়লেও সকলেই উঁকিঝুঁকি মেরে রম্ভাদর্শন চালু রেখেছেন। রম্ভাকেও দেখলাম, ব্যাপারটা বেশ এনজয় করতে, মাঝেমধ্যেই মুচকি হেসে সকলের দিকে মায়াবী চোখ তুলে তাকাচ্ছে।

ঠিক এরকমই একবার আমার আর রম্ভার শুভদৃষ্টির পুণ্যক্ষণে, কে যেন কানের কাছে কাঁপা গলায় বলে উঠল, "দুটো পয়সা ভিক্ষা দেবে, বাবা?" শুভদৃষ্টিতে বাঁধা পড়ায় বেশ বিরক্ত হয়ে পাশে তাকিয়ে দেখলাম, এক থুত্থুরে বুড়ি কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে। মাথাটা চট করে ব্যোম্ ভোলের মতো গরম হয়ে গেল, "হ্যাট্ হ্যাট্" করে তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। আশেপাশের লোকজনও বেশ বিরক্ত, ভাবখানা এমন যে, শুভদৃষ্টির সময়ে এ আবার কী আপদ! কেউ কেউ তো বুড়িকে দেখেই আবার অনন্ত শয়নের তোড়জোড় শুরু করলেন। বুড়ি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বিফল হয়ে বাসের থেকে নেমে গেল। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রম্ভার দিকে তাকাতেই দেখলাম, সে বেশ

বিভ্রাট

উদ্বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামতে যাচ্ছে। দেখে সকলেরই বেশ হৃদয়চূর্ণ হল কিন্তু তার আগেই ক কণ্ডাক্টর এবার মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরে ফেলল। মেয়েটি নিজের হাত ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। আমরাও কয়েকজন শিভ্যালরি দেখিয়ে প্রতিবাদ করতে উদ্যত হচ্ছি, এমন সময়ে কণ্ডাক্টর বলে উঠল, "আজ তোকে হাতেনাতে ধরেছি। এইবার? পালাবি কোথায়? রোজ রোজ বাসে উঠে পকেট কাটা?! আজ একদম তক্কেতক্কে ছিলাম..." সামনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক তখন অলরেডি নিজেদের পকেট ফাঁকা দেখে চমকে গেছে। কণ্ডাক্টর তখন চোর... থুড়ি, রম্ভার ব্যাগ থেকে সকলের মানিব্যাগ বের করছে, সব দেখেশুনে আমি তখন অনন্ত নিদ্রায় ডুবে যেতে যেতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে, নাহ্, আর রম্ভা দেখে কাজ নাই... নিদ্রাই শ্রেয়। ■

ছবির নামঃ কৈলাস...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

নবীনের ছোঁয়া

সামিমা খাতুন

দেখরে হেসে,
কালোর শেষে,
দিচ্ছে আলো হাতছানি।
সুখের স্বপন,
হবেই পূরণ,
জাগছে মনে আশখানি।
নতুন ভোর,
খুলুক দোর,
সুস্থ-নবীন ভাবনার,
বিবাদ ভুলে,
সবাই মিলে,
সাজাক জগৎ যে যার।
কাটুক কালি,
মনের খালি
ভরুক রবির কিরণে।
কেটে যাক,
যত 'পাক,
গড়ে উঠুক তাসের ঘর যতনে। ■
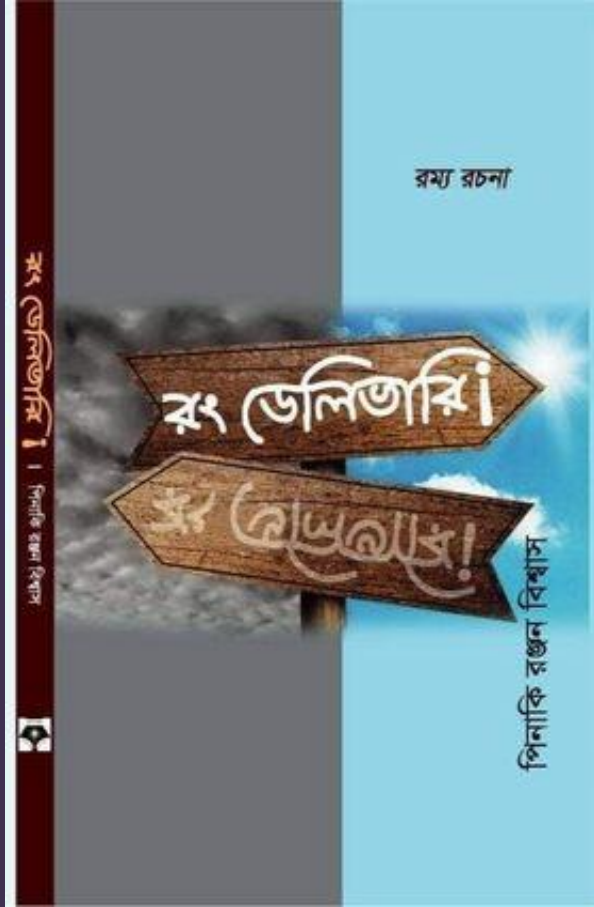
https://www.facebook.com/groups/183364755538153

বর্ষবরণ - কাঁটা তারের ওপারে

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

বাঙালির বর্ষ বরণকে হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পার হয়ে গিয়েছিলাম সীমান্তের কাঁটাতার, ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলনা। ঘনান্ধকারে ঢাকা সেদিনের পৃথিবীতে বন্দী হয়ে পড়েছিলাম এ পৃথিবীর বুকে আতস কাঁচে খোঁজার মতো বাংলাদেশ নামে ছোট্ট একটা দেশে। এখানেই এক প্রভাতে দূরভাষে খবর ভেসে এসেছিল একদিন নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে যিনি সুন্দর এই পৃথিবী আমায় দেখিয়ে ছিলেন, যার ভাষা আমায় দিয়েছিল এক আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি, তিনি পাড়ি দিয়েছেন রামকৃষ্ণ লোকে। বিশাল এক ঘরে বসে দূর থেকে নীরবে চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানিয়ে ছিলাম।

যদিও মাসটা বসন্ত, মনের মাঝে আচ্ছাদিত হয়েছিলো বর্ষার কালো মেঘ, বুকের মাঝে থেকে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম নিদারুন বজ্রপাত। এ দুঃসময়ে আমার সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম গভঃ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক জনাব রফিকুল ইসলাম মহসিন, যিনি আমার কাছে শুধুই মহসিন ভাই। তাঁর দুই পুত্র ‘পরম’ আর ‘তাদিব’ দেবশিশু হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল সামনে। বুকের ভেতর জমে থাকা কষ্টের পাথরগুলো দুই দেব

আবেগ

শিশু তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাতে একটু একটু করে সরাতে শুরু করলো। জমে থাকা মেঘের আস্তরণ সরে দেখা দিল রবির কিরণ। তাদের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠল আমার বসন্তের পলাশ আর শিমুলের লাল রং। সন্ধ্যায় দেব শিশুরা ফিরে যায় ঘরে আর খোলা আকাশে তারাদের মাঝে আমি খুঁজে ফিরি আমার মাকে। এমনি করেই দেখতে দেখতে পার গেলো তিনটে সপ্তাহ।

এখানে শোনা যায়নি চৈত্রের বিদায় বেলায় গাজন সন্ন্যাসীদের মুখে মুখে, “বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগি, মহাদেব” ধ্বনি। ১৪২৬ কে বিদায় জানানোর থেকে ১৪২৭ কে স্বাগত জানাতেই সবাই উদগ্রীব, কিন্তু এক ভয়ঙ্কর দৈত্যর ভয়ে ঘর থেকে বার হওয়া মানা। ৩১ শে চৈত্র ১৪২৬, দেব শিশু দুটি নাছোড় বান্দা, আগামীকাল ভোরে স্নান সেরে তাদের ঘরে গিয়ে আমায় নববর্ষ পালন করতে হবে। ফেরাতে পারিনি তাদের আবদার। সাক্ষী থেকে গেলাম নয়, হৃদয়ে গেঁথে নিলাম এক নুতন বর্ষকে। স্মৃতির পাতায় একদিন সব ধূসর হয়ে যাবে – রয়ে যাবে শুধু ১৪২৭ এর ১লা বৈশাখ দিনটি।

প্রতিদিন যেমন সূর্য্য ওঠে, সেদিনও তেমনই পূর্ব আকাশ একটু একটু করে রক্তিম হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর দৈত্যর স্পর্শে মৃত্যু অনিবার্য, ফলে ঘর থেকে বাইরে বার হওয়া বারণ। নেই কোন গাড়ি ঘোড়ার শব্দ, নেই নবীন বরণের কোন

আয়োজন। কথা মতো স্নান সেরে পৌঁছে গিয়েছিলাম মহসিন ভাইয়ের ফ্ল্যাটে। প্রতিটি জায়গার এবং দেশের নিজস্বতা থাকে, বাংলাদেশেরও আছে। মহসিন ভাইয়ের বাড়ী পৌছতেই দুই দেবশিশু আমায় তাদের বাহুডোরে অবদ্ধ করলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই বৌঠান পরিবেশন করলেন পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা। পান্তা ভাত বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা নয় একটু ব্যতিক্রমী।

মধ্য রাত পার করে ভাত রান্না করা হয় তারপর গরম ভাতে জল দিয়ে রাখা হয়। সকালে সেই ভাত গরম ইলিশ মাছ ভাজার সাথে পরিবেশিত হয়। দেশটির নাম বাংলাদেশ, কাজেই এক পদ বলে কোন বস্তু নেই। এক অপূর্ব পঞ্চ ব্যঞ্জনে পরিবেশিত হলো সেই ভাত। গত রাতে কি আমি কিছুই খাইনি? কি জানি ঠিক মনে করতে পারছিনা! এই সাত সকালে এতো ভাত আমি খেলাম কি করে! এবার নেই সুন্দর নতুন পোশাক পরে গান গেয়ে প্রভাত ফেরী করে বর্ষ বরণ করার আয়োজন।

এ দেশের ১৬ কোটি বাঙালী সাথে সেই অনিন্দ্য সুন্দর অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা আমি আর এক বাঙালী। ■

বাংলা নববর্ষের শুভ অবসরে, পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে বিশ্বের সকল বাঙালি এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রেমীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ সূর্যাস্ত - ডুলুং নদীর কোলে ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

স্বীকার করি

আবদুল বাতেন (আমেরিকা)

সুখ
সাম্পান,
তুমি আমার
হৃদ হ্রদে। এই
অসুস্থ অসুখী
হাহাকার-করা ধরা
খরায়, তুমিই আমার শান্তির
শাদা পায়রা বাক-বাকুম, বাকুম-বাক।
শহরের সুফলা বুকে অভদ্র রোদ্দুর সারাদিন
হাফপ্যাডেল মেরে মেরে যাবে নেতিয়ে, রেস্টুরেন্টে
পার্কে ঝোপঝাড়ে ফুটবে এবং পুড়ে পুড়ে কয়লা
হবে প্রেমের পল্লব। ক্লাসরুমে লাইব্রেরিতে
ল্যাবরেটরিতে ক্যাফেটেরিয়ায় পড়বে
খসে খসে উষ্ণ অবাধ আবদার
আকুতি। শুধু আমি অনিঃশেষ
আপ্লুত বেঁচে রবো তোমার
মন মঞ্জরীতে, স্বীকার করি
নির্দ্ধিধায়-তুমিই আমার
পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি
সরোবরী
সুখ। ■

নববর্ষ

অমিত কুমার সাহা

আজকের সকালের সূর্যটা একদম অন্যরকম
গাঢ় লাল রঙের, আগামীর বার্তাবাহক;
গোটা একটা বছরের পথপ্রদর্শক।

নববর্ষ মানেই আলাদা আবেগ,আলাদা আবেদন...
সে লাল খাতার প্রথম পাতায়
সিঁদুরের ছাপ অথবা নতুন জামার গন্ধ হোক।
সন্ধ্যার পরিবেশ জুড়ে বেলী আর জুঁই ফুলের মাদকতা
অথবা মিষ্টির প্যাকেটের সাথে
বাড়তি পাওয়া মোড়ক করা ক্যালেন্ডার।

চেনা মুখগুলোর সাথে পথচলতি শুভেচ্ছা বিনিময়
অথবা যান্ত্রিক বদান্যতায় পৌঁছে যাওয়া,
দূরে থাকা চেনা মানুষগুলোর কাছে।

হয়তো বদলাচ্ছে অনেক কিছুই, একটু দ্রুতই
বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের মূল্যবোধ; তবুও নববর্ষ
বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে তার নিজস্ব ঐতিহ্যে।
প্রতিবছর তাই প্রথম বৈশাখের সকালের সূর্যটাকে নতুন
মনে হয়; বাঁচতে ইচ্ছে হয় নতুন করে,
বাকি তিনশো চৌষট্টি দিনের অচিন আতর গায়ে মেখে। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত পুস্তক
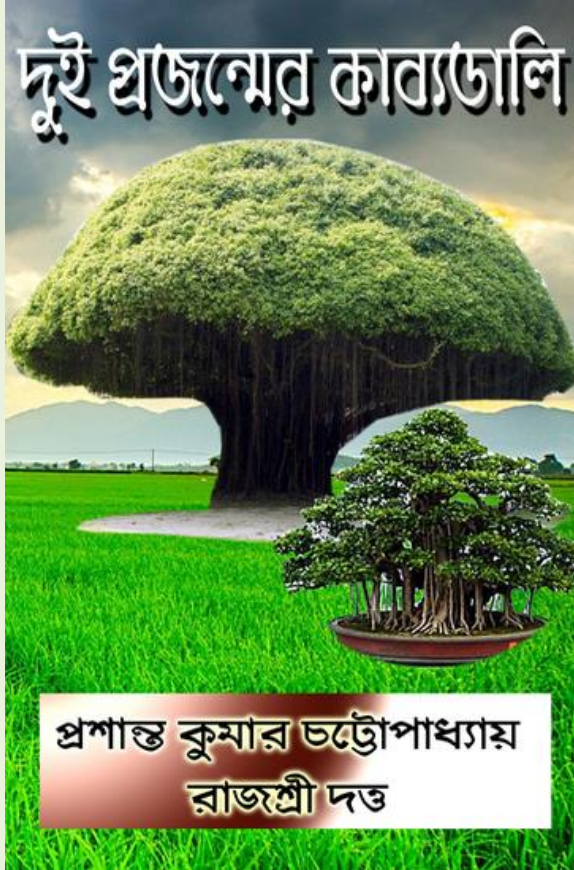
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

বাংলার নববর্ষ

প্রণব কুমার বসু

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। নতুন প্রজন্ম আসে নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে, তবুও পুরনো কি বিলীন হয়! থেকে যায় স্মৃতিকোঠায়...

বাংলা নববর্ষের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত "বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে" — এই সুমধুর ধ্বনি... ছুট্টে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা আর সাধ্যমত সাহায্য করা।

চড়কের দিন থেকেই মেলা শুরু হয়ে যেত। লোভনীয় ছোট ড্রাম, নানারকম খেলনা, খাবার ছাড়াও আকর্ষণীয় ছিল নাগরদোলা — লাইন দিয়ে উঠতে হ'ত। সব দোকানের কর্মচারীরা রাত জেগে কালীঘাট মন্দিরে লাইন লাগাত নতুন হালখাতার জন্য - নববর্ষের দিন সকাল থেকেই দল বেঁধে আমরা দোকানে দোকানে যেতাম মিষ্টির প্যাকেট আর নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে। চারিদিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো, মাইকে নতুন বাংলা গান বাজতো। রবীন্দ্রসদনে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ... এখন দিন পাল্টেছে — প্রযুক্তির প্রসার হয়েছে। তবুও পুরনো দিনের কথা কি সহজে ভোলা যায়! ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুন ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মে, ২০২১